বাঙালি মধ্যবিত্ত, আত্মকেন্দ্রিকতা ও বিপর্যয়ের ভূমিকা

শিবনারায়ণ রায়

।। এক ।।

অধিকাংশ বাঙালি কি ক্রমশ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে, এমনতরপ্রশ্ন নিয়ে বিবেচনা করতে গেলে প্রথমেই দুটি মুখ্য-শব্দেরজাতার্থ এবং ব্যক্তার্থ স্পষ্ট করা দরকার। "অধিকাংশবাঙালি" বলতে কাদের কথা ভাবছি? কোন কোন মনোভাব তথা আচরণ"আত্মকেন্দ্রিকতা"-র নিশ্চিত লক্ষণ?

দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমার ধারণা যে যখন আমরাঅধিকাংশ বাঙালির কথা বলি বা ভাবি বা সে সম্পর্কে লিখি তখন প্রকৃতপক্ষে যারা "অধিকাংশ" বাঙালি তাদের কথা আমাদেরমনে থাকে না। চাষী, জেলে, মাঝি, জোলা, কারিগর, মিস্ত্রি, স্কুল-কলেজেনা-যাওয়া ঝি-বউ, বস্তি-ঝোপড়া এবং খালের দুধার থেকে যাদের নগর-উন্নয়নেরনামে বারবার উচ্ছেদ করা হচ্ছে তারা, খনির অথবা কলকারখানার মজুর,ফিরিওয়ালা, যৌনকর্মী, অকড়িয়া বা উঞ্ছজীবী বা পাতকুড়ানিস্ত্রীপুষ— বাংলা তাদের মাতৃভাষা হলেও এসব আলোচনায় তারা ক্বচিৎ"অধিকাংশ" বাঙালির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। আসলেআলোচনা যাঁরা করেন অথবা সে বিষয়ে যাঁরা লেখেন এবং তাঁদের সে সবআলোচনা যাঁরা শোনেন বা সে সব লেখা পড়েন, তাঁরা প্রায় সকলেইসমাজের একটা বিশেষ স্তরের অধিবাসী। এঁরা বাবু বা ভদ্রলোক, অধিকাংশইএসেছেন পিতৃপুষের সূত্রে ঐতিহ্যস্বীকৃত "উঁচু জাত"থেকে, সমাজতত্ত্বের ভাষায় এঁরা নিম্নমধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ।(উচচবিত্তদের এঁদের মধ্যে ধরছি না, কারণ এসব আলোচনায় তাঁরা ক্বচিৎকাল ব্যয় করেন)। এঁরা কমবেশি শিক্ষিত, কেউ কেউ খুবইউচচশিক্ষিত, কারো কারো দেশবিদেশে গতাগতিও আছে। কিন্তু এঁরানিশ্চয়ই সংখ্যার হিসাবে "অধিকাংশ" বাঙালি নন, যদিও অনেকসময়ে এঁদের বিশেষ সমস্যাগুলিকে এঁরা অধিকাংশ বাঙালির সমস্যা বলে অথবাভেবে নিজেদের স্তোক দেন। দেশ স্বাধীন (এবং বঙ্গদেশ বিভক্ত) হবারঅর্ধশতাব্দী পরেও পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা বাস্তবে "অধিকাংশ"বাঙালি, "ক্রমশ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাওয়া" মোটেই তাঁদেরবিশেষ লক্ষণ বা সমস্যা নয়। টিঁকে থাকাটাই তাঁদের জীবনের প্রথমএবং প্রধান সমস্যা— এবং তারই অবম সর্ত হিসেবে দু'বেলাপেটভরার মতো খাদ্য, মাথার ওপরে নির্ভরযোগ্য ছাউনি, ছেলেমেয়েদেরকিছুটা অন্তত শিক্ষার আঞ্জাম, ব্যাধিতে চিকিৎসা এবং দাওয়াই,নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজন মেটানোর একটা নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা, এসবধান্দা নিয়েই তাঁরা বিপর্যস্ত। বিভিন্ন সূত্র থেকে যতটুকু খবর পাই,সারা ভারতে এই দুরবস্থদের সংখ্যা শুধু বাড়ছে না, তাদের সামনে আলোরকোনো চিহ্ও বিশেষ দেখা যাচ্ছে না। এই হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ মোটেই ব্যতিক্রম নয়।বরং অধিকাংশ মানুষ যাঁরা সমকালীন পশ্চিমবঙ্গীয় সমাজের এবংআর্থ-রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার নিচের তলার বাসিন্দা, তাঁদেরঅবস্থা ভারতের আরো বেশ কয়েকটি রাজ্যের তুলনায় বর্তমানে আরোদুর্বিষহ। টিঁকে থাকার প্রয়োজনেই তাঁদের দরকার সাঙাতি, সহযোগ,সমাজব্যবস্থার পড়োশিদের সঙ্গে আত্মীয়তা। আত্মকেন্দ্রিকতার বিলাস তাঁদেরক্ষেত্রে প্রায় অকল্পনীয়।

অবশ্য একই সূত্র থেকে এ সংবাদও মেলে যে গত পঞ্চাশ বছরেভারতে মধ্যবিত্তদের আর্থিক অবস্থার লক্ষণীয় রকমের উন্নতি ঘটেছে।পশ্চিমবঙ্গ এ ব্যাপারেও ব্যতিক্রম নয়। বর্তমানে এই রাজ্যের রাজধানী এবংপ্রধান মফস্বল শহরগুলিতে মধ্যবিত্তদের ঘরে মাত্রাতিরিক্ত বিলাস-সামগ্রী এবংতাদের জীবনযাত্রায় অপ্রমিত বিলাস-ব্যসনের প্রসার লক্ষ না করেউপায় নেই। পশ্চিমের উদ্ভাবিত বেশির ভাগ বিলাস-সামগ্রীই এখন কলকাতারমস্ত মস্ত বাতানুকূল দোকানবাজারে মেলে এবং তাদের জন্যস্থানীয় খরিদ্দারের অভাব হয় না। অর্থাৎ নিচের তলায় অন্ধকার যেমন জমাটবাঁধছে এবং বিস্তৃত হচ্ছে,

ওপরদিকে তেমনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীও বিবর্ধমান এবংতাদের জন্য ভোগ্যপণ্যের সরবরাহও প্রাচুর্যে ও বৈচিত্রে চিত্তচমৎকারী।দ্রুত উপচীয়মান সরকারি আমলা এবং ফাটকাবাজ, জমির কারবারি এবংরাজনৈতিক দলনেতা, ঝিবিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যাপক এবং জনপ্রিয়ঔপন্যাসিক বা কথাসাহিত্যিক, সমাজসেবার নামে নানা বেসরকারি উদ্যোগেরকর্মকর্তা, ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কার, খবরের কাগজের মালিক এবং বিভিন্নসংস্থার উঁচু পদের কর্মচারি, উকিল, ডাক্তার, প্রযুক্তিবিদ এবংপ্রাইভেট টিউটর— তালিকা বাড়াবার দরকার নেই— যেমনসমকালীন ভারতবর্ষের অন্যান্য কোনো কোনো রাজ্যে, তেমনইকমিউনিস্ট-শাসিত পশ্চিমবঙ্গে এদের প্রায় নিরঙ্কুশ রবরবা।রাতের বেলা পার্ক স্ট্রিট অঞ্চল ঘুরে এলে মনে হতেই পারে লন্ডন, পারি,বার্লিন বা নিউ ইয়র্কের মতো কলকাতাও এক অঢেল ফুর্তির শহর। এবংযাঁরা নিম্নমধ্যবিত্ত তাঁদের মধ্যে অনেকেরই একান্ত বাসনা— যেটিতাঁদের ছেলেমেয়েদের মনে সঞ্চারিত করে দিতে তাঁরা ব্যাকুল— সেটি হলকোনো না কোনো ভাবে মধ্যবিত্তের ঐ সম্ভোগসম্পন্ন পর্যায়ে যত দ্রুত উঠেযাবার। তার জন্য শক্তিমান এবং বিত্তবানদের চামচাগিরি, ফেরেববাজি ওছলচাতুরি, প্রবঞ্চনা বা শরারতি, সবকিছুই চোখ খুলে কিংবা বুজে মেনেনেওয়া চলে যদি উদ্দিষ্ট উন্নতি করতলগত হয়।

আর এখানেই আমাদের আলোচনায় দ্বিতীয় শব্দটির প্রসঙ্গএসে পড়ে। "আত্মকেন্দ্রিক" বলতে কী বোঝায়? এবং যদিঅধিকাংশ বাঙালি আত্মকেন্দ্রিকতার দিকে ঝোঁকে তাহলেই বা এত দুশ্চিন্তা কেন এবং কাদের? আত্মকেন্দ্রিক অর্থ নিশ্চয়ই অহংকারী নয় ; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অত্যন্ত অহংকারী পুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁকেতো কোনোভাবেই আত্মকেন্দ্রিক বলা চলে না। বঙ্গদেশে এমন পরার্থপর মানুষ আরক'জন জন্মেছেন? আলু-পটল বিক্রি করার কথাটি হয়তোকিম্বদন্তী, কিন্তু তঁার অস্মিতা যেমন কখনো কোনো শক্তিমান ব্যক্তি বাপ্রতিষ্ঠানের কাছে মাথা নত করে নি, তাঁর হৃদয় এবং কর্মশক্তিতেমনই সর্বদাই অসহায় এবং আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্যার্থে ব্যাপৃত ছিল।অপরপক্ষে যাঁরা আত্মজিজ্ঞাসু, আত্মদীপ, এমনকি আত্মমগ্ন তাঁদের সম্পর্কেওআত্মকেন্দ্রিক শব্দটি অপ্রযোজ্য মনে হয়। বিপরীতপক্ষে তাঁরাই যথার্থআত্মকেন্দ্রিক যাঁরা শুধু নিজেদের স্বার্থ, সুখ-সুবিধা, খ্যাতি-প্রতিপত্তিনিয়েই নিত্য ব্যাপৃত ; যাঁরা অপরের সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ,সুবিধা-অসুবিধা বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ; যাঁরা অপরকে শুধু নিজেদেরপ্রয়োজন- সাধনের উপায়মাত্র বিবেচনা করেন। কোনো সমাজে এমনস্ত্রীপুষের সংখ্যা দ্রুত এবং প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেলে তা সকলেরপক্ষেই দুশ্চিন্তার বিষয় বটে। বিশেষ করে এই"আত্মকেন্দ্রিক" ব্যক্তিরা যদি হন সমাজের মাথা এবংপথনির্দেশক।

এখন আত্মা বলে কোনো কিছু থাক বা নাই থাক, প্রতিব্যক্তিই অন্তত শারীরসূত্রে অপর ব্যক্তি থেকে অনিবার্যভাবে স্বতন্ত্র। কিন্তুস্বতন্ত্র হলেও কোনো ব্যক্তিই আত্মসম্পূর্ণ নয়। বস্তুত, স্থূল শারীরিক বিচারেদুই ব্যক্তির সংগম ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তির উদ্ভব অসম্ভব (এমনকি সম্প্রতিবিজ্ঞানের কল্যাণে যারা টিউব বেবি রূপে জগতে প্রবেশ করে, তাদেরক্ষেত্রেও দুজনের সহযোগ আবশ্যিক সর্ত।) আরজন্মের পর প্রতিপালন এবং বিকাশের জন্য ব্যক্তিকে নিয়তই বহুজনেরওপরে নির্ভর করতে হয়। মনুষ্যত্ব বিকাশের যা প্রধান অবলম্বন—ভাষা— তা একটি সমাজের সামূহিক অবদান, কোনো একটি ব্যক্তির—তা সে তিনি যত প্রতিভাবানই হন— নিজস্ব উদ্ভাবন নয়। তাছাড়া শুধুমা-বাবা, পরিবার, আত্মীয়স্বজন, শিক্ষক, সহকর্মী এবং সমাজ নয়,প্রকৃতির বিবিধ দান— আলো, জল, হাওয়া, মাটি, গাছপালা— ছাড়াব্যক্তির অস্তিত্ব এবং বিবর্ধন অকল্পনীয়। ফলত বিশুদ্ধ আত্মকেন্দ্রিকতারচর্চা শুধু মর্তুকামেই পরিণতি পেতে পারে।

কিন্তু যদিও ব্যক্তির অস্তিত্ব অনিবার্যভাবেই অপর-নির্ভর, এবিষয়ে বিবৃদ্ধ এবং কর্মান্বিত চেতনা গড়ে উঠতে সময় লাগে, অনেকেরক্ষেত্রে সে চেতনা সামান্য বিকাশের পর থেমে যায়। শিশু যতদিন শিশু থাকেততদিন সে প্রায় নিশ্চিন্তভাবেই ধরে নেয়, এ জগত তার সুখের জন্যইরচিত। ত্রমে, কিছু আগে কিছু পরে, সে টের পেতে শু করে যে, এইঝিজগত, এমনকি তার পারিবারিক-সামাজিক পরিপার্শ্বও তার তৃপ্তিবিধান বা নিরাপত্তার জন্যই বিশেষভাবেরচিত হয় নি বা পরিচালিত হয় না, এই জগতের নিজস্ব নিয়ম-নির্দেশ আছে,তাকে অগ্রাহ্য করলে বিপদের অথবা শাস্তির আশঙ্কা আছে। কিছুটাঅভিজ্ঞতা, কিছুটা শিক্ষার সূত্রে সে বোঝে যে আমরাসামাজিক-প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে যা পাই তার যোগ্য হবার জন্যপরিবর্তে আমাদেরও কিছু দেবার দায়িত্ব আছে। এই দায়িত্ববোধ মানসিকবয়ঃপ্রাপ্তির প্রথম সোপান। কিন্তু মানুষের দুর্ভাগ্য, দেহে বাড়লেওঅনেকের মানসিক বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটে না, অথবা ঘটলেও বেশিদূর এগোয় না। এইদুর্ভাগ্যের নানা কারণ আছে, এখানে তা নিয়ে আলোচনা করব না। তবে এটাসুনিশ্চিত যে-সমাজ অপরিণতবুদ্ধি মানুষদের দ্বারা চালিত তার অবক্ষয়অনিব

র্য, কালক্রমে তার বিলোপও ঘটতে পারে।

স্বার্থপরায়ণতার যে অর্থে আত্মকেন্দ্রিক শব্দটির এখানে গ্রহণকরেছি, সেই অর্থে সম্ভবত সব স্ত্রীপুষই কিছুটা আত্মকেন্দ্রিক (শৈশবঅবস্থায় সবক্ষেত্রেই এটি স্পষ্ট), কিন্তু বিত্তবানদের ক্ষেত্রেএই বৃত্তিটি যত প্রকট এবং প্রবল, দরিদ্রসাধারণের মধ্যে ততটা নয়।যাদের অর্থবল নেই সমাবস্থার স্ত্রীপুষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে জড়িতহওয়া তাদের টিঁকে থাকার জন্যই জরি। মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্তরাউচচমধ্যবিত্তের মতো বেপরোয়া নয়। তাঁদের ভিতরে যখন আত্মকেন্দ্রিকতা খুবপ্রবল হয়ে ওঠে, তখন তাঁদের অন্তর্গত কিছু বুদ্ধিমান ব্যক্তির টনকনড়ে। তবে সংকটটা যে শুধু তাঁদের নয়, পুরো সমাজের এই ভ াবেই তাঁরাসেটাকে দেখেন এবং দেখাতে চান। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্তপরিবারগুলির মধ্যে এই ধরনের একটা সংকটবোধ সম্প্রতিকালে দেখাদিয়েছে— তার হেতু এবং সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে আলোচনার অবশ্যইপ্রয়োজন অ াছে।

।।দুই।।

বাঙালি সমাজ আগাগোড়াই বহুভাগে বিভক্ত ছিল— আঞ্চলিক,ধর্মীয় জাতপাঁতের বিভেদ ইত্যাদি— কিন্তু উনিশ শতকে ইংরেজ শাসনেরসূত্রে এদের ভিতর থেকেই একটি বিশেষ শ্রেণী ক্রমে উদ্ভূত হয়, যাদের বর্তমানেপ্রচলিত সাধারণ নাম মধ্যবিত্ত। ইংরেজি শিক্ষা এবং ইংরেজ শাসন ওইংরেজি ব্যবসাবাণিজ্যের সঙ্গে সহযোগিতাই ছিল এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবের সূত্র।ঐতিহ্যিক প্রাধিকারে যাঁরা বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের উচচ বর্ণের তথাজাতির মানুষ মুখ্যত তাঁরাই—অর্থাৎ ব্র াহ্মণ, কায়স্থ এবং বৈদ্য এবংস্বল্প সংখ্যায় নবশাখের অন্তর্গত কিছু উদ্যোগী ব্যক্তি—এই বিশেষশ্রেণী গড়ে তোলেন। পশ্চি মের বুর্জোয়াদের সঙ্গে বাঙালি মধ্যবিত্তের একটা বড়পার্থক্য ছিল। একেবারে গোড়ার দিকের কয়েকজনকে বাদ দিলে ইংরেজ শাসনপ্রতিষ্ঠা হবার পর এঁদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই ব্যবসাবাণিজ্যে লক্ষ্মীর সন্ধান করেন নি।তার একটা কারণ ঔপনিবেশিক পরিবেশে এদেশী মানুষের পক্ষে ব্যবসাবাণিজ্যেসফল হবার সম্ভাবনা ছিল কম ; কিন্তু অন্য বড় কারণ এঁদের মনেজমিদারির মোহ এবং ব্যবসাবাণিজ্যে গভীর অনীহা। মোদ্দা বাঙালি মধ্যবিত্তের একটাপ্রধান অংশ শহরবাসী জমিদার, চাকুরীজীবি, সরকারি অথবা বেসরকারিবিদেশী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারি। তাছাড়া ইংরেজি-উচচশিক্ষানির্ভর কিছু পেশাও এঁদের আকৃষ্ট করে ; অনেকেই ছিলেনশিক্ষক, উকিল, ডাক্তার এবং সাংবাদিক। উনিশ শতকে এবং বিশ শতকেরগোড়ার দিকে বাঙালি মধ্যবিত্তদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ছিল নিতান্ত নগণ্য।মুসলমান ধর্ম-নেতারা ছিলেন ইংরেজি শিক্ষার বিরোধী ; আরমুসলমানদের মধ্যে যে মুষ্টিমেয় সংখ্যক মানুষ নিজেদের আসরফ বা অভিজাতবিবেচনা করতেন তাঁরাও দীর্ঘদিন অভিমানবশত নবাগত শাসকদের সঙ্গে বিশেষসহযোগ করেন নি। ফলত উনিশ শতকে সারা ভারতে ইংরেজ শ াসন বিস্তারহওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই নবোদ্ভূত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেশ কিছু ব্যক্তি (যাঁরাপ্রায় সকলেই পরম্পরাসূত্রে উচচবর্ণের হিন্দু) নতুন শাসকদেরতল্পিবাহক হয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েন। অবিভক্ত বঙ্গদেশে, বিশেষ করেনতুন রাজধ ানী কলকাতায়, ইংরেজ রাজছত্র এবং ব্যবসাবাণিজ্যের আশ্রয়ে যাঁরা বেশকিছু গুছিয়ে নেন তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন মুখুজ্জে, বাড়ুজ্জে, চাটুজ্জে,ঘোষ, বোস, মিত্র, দত্ত, সেনগুপ্ত, দাশগুপ্ত ইত্যাদি পদবীধারী হিন্দুউচচবর্ণের লোক। এঁদের চরিত্র যে খুব আকর্ষণীয় ছিল না সমকালীন সংবাদপত্র,এবং বিভিন্ন কাহিনীতে এবং নক্সায় তার পরিচয় মেলে।

কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা শুধু দু'পয়সা রোজগারের পথখুলে দেয় নি। যে সব ভাবনাচিন্তার ফলে রেনেসাঁসের সময় থেকে পশ্চিমীসমাজসংস্কৃতি আলোড়িত হচ্ছিল, যাদের ধাক্কায় মধ্যযুগের সংকীর্ণ এবং অন্ধকারচৌহদ্দি ভেঙ্গে ইয়োরোপের এক একটি দেশের উদ্যোগী মানুষরা পৃথিবীরদিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, ইংরেজি শিক্ষার সূত্রে সেই সবভাবনাচিন্তা বাঙা লি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কিছু চিন্তাশীল লোকের মনেওআলোড়ন তোলে। এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্যদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করেবহুমুখী জ্ঞান চর্চা, বেন্থামের উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গী এবং সমাজসংস্কারক বিবিধ কর্মোদ্যম, টম পেইন-এর মানবীয়অধিকারতত্ত্বের বৈপ্লবিক ঘোষণা এবং বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন, জনস্টুয়ার্ট মিলের অভিজ্ঞতানির্ভর আরোহী যুক্তিবাদ এবং নরনারীর সাম্যেরপ্রস্তাব— এ সবের ধাক্কা এসে লাগে বাঙালি তথা ভারতীয় সাবেকিচিন্তার জগতে। আর এই ধাক্কার ফলে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিতর থেকেকিছু মানুষ ধর্মীয় সংস্কার, সামাজিক সংস্কার, ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ,আধুনিক শিক্ষার প্রসার, নারীদের অবস্থার উন্নতি, এইসব নানাউদ্যোগে অনুপ্রেরিত হন। সংখ্যাল্প হওয়া সত্ত্বেও এঁদেরউদ্যোগ-উদ্যমের ফলে বঙ্গদেশের বিশেষ করে সাংস্কৃতিক জীবনে যা ঘটেতাকেই বলা হয় বঙ্গীয় রেনেসাঁস। বাঙা

লিদের মধ্যে এই ঐতিহাসিক নবনির্মাণের প্রথমউদ্যোক্তা রাজা রামমোহন রায় এবং তাঁরই পাশাপাশি তণ ইউরেশিয় ানশিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। এঁদেরই যথার্থ উত্তর-সাধকঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, র‍্যাডিক্য াল ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন,বাংলা কবিতার বিপ্লবসাধক মাইকেল মধুসূদন এবং বাংলা গদ্যসাহিত্যেরনির্মাতা ও শ্রেষ্ঠ শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র, দুঃসাহসী সমাজসংস্কারক দ্বারকানাথগাঙ্গুলী এবং দুর্গামোহন দাস, বিজ্ঞানবুদ্ধির প্রচারক মহেন্দ্রলাল সরকার,আদর্শবাদী সম্পাদক ও সংবাদসেবী দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সংগঠিত শ্রমিক আন্দে ালনের পথপ্রদর্শকশশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সব চাইতে যেটিমূল্যবান এবং স্থায়ী কৃতি সেটি হল মাত্র একশো বছরের মধ্যে বাংলা ভাষা ওসাহিত্যের অভূতপূর্ব বিকাশ ; মহাপ্রতিভাধর রবীন্দ্রনাথেররচন াবলীতে রেনেসাঁসের এই দিকটির পরাকাষ্ঠা দেখি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেএকথাও স্মরণীয় যে সমাজসংস্কারের যে সব বিবিধ প্রচেষ্টা উনিশশতকে দেখা যায়, কয়েক দশক ধরে যার নেতৃত্বে এসেছিল মুখ্যত ব্রাহ্ম আন্দোলনথেকে, সেগুলি না ঘটলে সংকীর্ণবুদ্ধি এবং বিলাসপ্রবণ বাঙালি মধ্যবিত্ত হিন্দুহুতোমি জগতেই আবদ্ধ থাকত, তার একটি উল্লেখ্য অংশ বঙ্গ তথা ভ ারতেরইতিহাসে আধুনিক যুগের নেতৃত্ব দিতে পারত না। আধুনিকতার যে মহামন্ত্রফরাসী বিপ্লবের সময়ে ঘোষিত হয়— স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব বামৈত্রীর সেই আদর্শ— বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একাংশের মাধ্যমে তাযতটা প্রভাব ফেলেছিল সম্ভবত ভারতের অন্য কোনো অঞ্চলে তেমনপ্রভাব ফেলে নি।

কিন্তু বঙ্গীয় রেনেসাঁসের মূল ত্রুটিগুলিও কিছুঅপ্রত্যক্ষ নয়। এই আদর্শগুলি বাইরে থেকে আমদানি করা, ভিতরথেকে স্ফূরিত হয়ে ওঠে নি। বিদেশী শাসনের অধীনে থাকার ফলে এ দেশেরনেতারা সম্পূর্ণ ভাবে স্বনির্ভর হতে শেখেন নি ; প্রতিটিসমাজসংস্কারের প্রস্তাবকে আইনসঙ্গত এবং কার্যকরী করবার জন্যতাঁদের বেশিটাই নির্ভর করতে হয়েছে শাসকদের সম্মতি ও সমর্থনেরওপরে। তাছাড়া এইসব ধ্যানধারণা তাঁদের মননকে উজ্জীবিত করলেও প্রায়ক্ষেত্রেই তাঁদের জীবনচর্য ার গভীরে স্থান পায় নি। ফলে আধুনিকজ্ঞানচর্চার ভিত্তিতে উচচ শিক্ষা তথা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে বটে,কিন্তু সমাজের নিচের দিকের প্রধান অংশ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিকশিক্ষার সুযোগ এবং অধিকার থেকেও বঞ্চিত থেকে গেছে। উচচশিক্ষ ারসুযোগ তাদের ক্ষেত্রে একান্ত দুরাশা। বিশেষ করে স্ত্রীলোকদেরভিতর শিক্ষার প্রসার খুব ধীর গতিতে এগিয়েছে, এবং ফলে বহুসংস্কারকের পরিবারের বাইরের দিকে যতটা আধুনিক চিন্তারপ্রভাব দেখা যায়, তার তুলনায় অন্দরমহলে তার অ ালো খুব সীমাবদ্ধক্ষেত্রেই ছড়িয়েছে। এইসব ত্রুটির ফলে রেনেসাঁসের ভিতর দিয়ে যেব্যাপক এবং সুগভীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব সূচিত হওয়ার কথা তাএদেশে ঘটে নি। সমাজের প্রধান অংশই রয়ে গেছে অভাব, অসাম্য এবংদৃঢ়প্রো থিত কুসংস্কারের অন্ধকারে। এবং নিম্নস্তরের জীবনেপ্রতিষ্ঠিত সে ব্যাপক অন্ধকার উপরের তলার আলোকেওস্বপ্রতিষ্ঠ হতে দেয় নি।

তথাপি এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেপরবর্তী আশি বছরে অবিভক্ত বঙ্গদেশে সীমাবদ্ধ একটি স ামাজিক স্তর গড়েউঠেছিল যাদের অভিধা ছিল ভদ্রলোক এবং যাদের রীতিনীতি আচার আচরণেযুক্তিশীলতা, নীতিবোধ, সংযম, জ্ঞানচর্চা, পরহিতৈষিতা, সামাজিক ওপারিবারিক দায়িত্ববোধ ইত্যাদি কিছু গুণ আবশ্যিক চর্চার বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি পায়। সম্প্রতিকালে তথাকথিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেঅনেকেই এই ভদ্রলোক অভিধাটিকে অশ্রদ্ধেয় করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরাসম্ভবত সচেতনভাবেই বিস্মৃত হন যে বঙ্গদেশীয় সমাজসংস্কারকদের সকলেই যেমন ছিলেন এই ভদ্রলে াক গোষ্ঠীরঅন্তর্ভুক্ত, তেমনি পরে বিশ শতকের গোড়ায় যাঁরা স্বদেশী আন্দোলনে এবংসমাজবিপ্লবের প্রচেষ্টায় অত্যন্ত বিপৎসঙ্কুল পথ বেছেনিয়েছিলেন তাঁরাও প্রায় সকলেই এসেছিলেন এই ভদ্রলোক গোত্রীয় জগতথেকে। শুধু সাহিত্যে, শিল্পে, জ্ঞানচর্চায় এবং আধুনিক শিক্ষা বিস্তারেনয়, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনে এবং সমাজের আমূল পরিবর্তনে যাঁরাপ্র াণপাত করেছিলেন তাঁরা বঙ্গীয় রেনেসাঁসেরই সন্তান বাঙালিভদ্রলোক। তাঁরা কেউ কেউ মধ্যবিত্ত, অধিকাংশই নি ম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকেএসেছিলেন ; বিশের দশক থেকে কিছু কিছু শিক্ষিত মুসলমান এবংশিক্ষিতা নারী যোগ দিলেও এই সব আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা ছিলউচচবর্ণের শিক্ষিত হিন্দু পরিবারের আদর্শবাদী যুবকদের। শুধু নিজেরস্বার্থ নয়, শুধু আপন আত্মীয় পরিবারের লাভ-ক্ষতির হিসেব নয়, দেশের এবংদশের স্বার্থ তথা কল্যাণ এঁদের চিন্তার এবং ক্রিয়াকল াপের বিষয় ছিল।এই ভদ্রলোকদের জগতে আত্মপরায়ণ শুভনাস্তিক্য চারিত্রিক দার্ঢ্য এবংআদর্শবাদের অনুপ্রেরণাকে গ্রাস করতে পারে নি।

আমি যে সালে জন্মাই জাতীয় সত্যাগ্রহ আন্দোলন তখন তুঙ্গে,এবং আমার শৈশবে এবং বাল্যকালে আমি এমন বেশ কিছু স্ত্রীপুষ দেখেছি যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য সবকিছু বিসর্জন দিতে এবং প্রাণের ঝুঁকি নিতেপ্রস্তুত। তারপর তারি পাশ াপাশি দেখা দিল সাম্যবাদের আদর্শ। বিশেরদশকে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের একাগ্রচিত্ত প্রচেষ্টায় এবং অক্লান্তপ্রচারের ফলে শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে কিছু বিবেকবান ব্যক্তিজাতীয় স্বাধীনতা এবং সমাজবিপ্লবের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিষয়ে সচেতন হয়েকমিউনিস্ট আদর্শ গ্রহণ করেন। কাজী নজল ইসলামের বৈপ্লবিক গদ্য এবংপদ্য আমার মতো নিম্নবিত্ত ঘরের বহু ছ াত্রছাত্রীকে উদ্দীপিত করেছিল। তাঁরকবিতায় নজল সম্মিলন ঘটালেন স্বাধীনতার, সাম্যের, নারীমুক্তির, ধর্মীয়বিভেদের ঊর্ধের্ব মানবিকতার আদর্শের। বিশুদ্ধ শিল্পবিচারে নজলের রচনায়কিছু কিছু ত্রুটি রয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাঁর বৈপ্লবিক ঝিাসেরদীপ্যমানতা, তাঁর অনুভবের প্রাবল্য এবং প্যাশন, তাঁর দুর্জয় সাহস এবংপ্রাণশক্তি একটি প্রজন্মকে অনুপ্রেরিত করে। সামান্যকিছু পরে কলেজে ছাত্রাবস্থায় যে আদর্শ আমাদের প্রজন্মেরঅনেকের মন জয় করেছিল তা হল একটি শে াষণমুক্ত, বিকাশধর্মী, সহযোগনির্ভর,স্বাধীনতা ও সাম্যভিত্তিক ঝিব্যাপী মানবসভ্যতার স্বপ্ন। আমারব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্মৃতির ওপরে নির্ভর করে বলতে পারি, বহু ত্রুটিএবং স্ববিরোধ সত্ত্বেও ত্রিশের দশকে বাঙালি শিক্ষিত তণ-মনে আদর্শব াদেরবিশেষ স্থান ছিল। নানা ধারা এসে মিশেছিল এই আদর্শবাদে, কিন্তু তার মূল প্রেরণাছিল স্বাধীনতা এবং সাম্য। ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজজীবনে, শিক্ষাক্ষেত্রে, শিল্প-সাহিত্যে,রাজনীতি এবং ছাত্র আন্দোলনে তার প্রভাব ছড়িয়ে যায়। তাছ াড়া আমাদেরসামনে ছিলেন পূর্ববর্তী প্রজন্মের কিছু স্ত্রী-পুষ যাঁরা আদর্শেরপ্রতি আনুগত্যে জীবনপণ করেছিলেন— কার াগার, নির্বাসন, মৃত্যুদণ্ড,দারিদ্র্য, সাংসারিক জীবনে চরম বিপর্যয় যাঁদের পথভ্রষ্ট করে নি।

।। তিন।।

তারপর ঘটল চল্লিশের দশকে বিপর্যয়ের পর বিপর্যয়।মহাযুদ্ধের প্রথম ধাক্কাতেই বাঙালি ভদ্রসমাজের ভিত নড়বড়ে হয়ে গেল।দু'একটি জাপানী বোমা পড়তেই কলকাতার অর্ধেক মধ্যবিত্ত শহর ছেড়ে গ্রামে-মফস্বলে পলাতক হল।তারপর এল সেই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ। "ফ্যান দাও গো"-র সেই মর্মভেদী কান্না আজ ষাট বছর পরেওদুঃস্বপ্নে শুনতে পাই। কলকাতার পথে-ঘাটে দিনের পর দিন অনশনে কঙ্কালসারস্ত্রীপুষ শিশুদের ইতস্তত পড়ে থাকা মৃতদেহ— মানুষের তৈরিসেই মন্বন্তরে কত জন মারা যায় তার নিশ্চিত হিসেব পাওয়া যায় না—সম্ভবত অবিভক্ত বঙ্গের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী সেই মহা বিপর্যয়েবিলুপ্ত হয়। কিন্তু আরও বাকি ছিল। যুদ্ধ শেষ হতেই ঘটল "মহাকলকাতা হত্যাকাণ্ড", হিন্দু-মুসলমান বিরোধের আগুন ছড়িয়েপড়ল সর্বত্র। মানুষের মধ্যে যে সব বৃত্তি ধবংসমুখী ভেতরে কিংবা বাইরে তাদেরওপরে আর কোনো শাসন রইল না। আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতারা দ্রুতক্ষমতা অর্জনের তাগিদে দেশবিভাগে রাজি হলেন।বিভাগোত্তর কঠিন সমস্যাগুলির মোকাবিলা কীভাবে হবে তার সামান্যতমব্যবস্থা না করে, গান্ধির নির্দেশকে অগ্রাহ্য করে, জবাহরল াল, প্যাটেল,রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ কংগ্রেসী নেতারা বড়লাট মাউন্টব্যাটেনের নেতৃত্বমেনে নিলেন। লক্ষ লক্ষ স্ত্রীপুষকে ঘর ছাড়া করে প্রতিদ্বন্দ্বী দুইস্বাধীন রাষ্ট্র জন্ম নিল। স্বাধীনতা এবং দেশ বিভাগে সবচাইতে বড়ক্ষতি হয় পশ্চিমবঙ্গের। পূর্বাঞ্চল থেকে অগণিত শরণার্থী প্রায়সর্বস্বান্ত অবস্থায় আশ্রয় নিলেন শিয়ালদা এবং হাওড়া স্টেশনে।নিঃসম্বল মানুষে ছেয়ে গেল কলকাতার পথঘাট ; তারা ক্রমে ছড়িয়ে গেলগ্রামে মফস্বলে। রেনেসাঁসের একশো বছরে যে ভদ্র সমাজ- সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিলএই সব চাপে এক দশকের ভিতরে তা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেল। একদিকে"এলোমেলো করে দে মা লুটেপুটে খাই" নীতি অনুসরণ করেগজিয়ে উঠল এক শ্রেণীর হঠাৎ বড়লোক— স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোনোঅপকর্মেই যাদের কিছুমাত্র সঙ্কোচ নেই। অন্যদিকে পড়ে রইলেন অসংখ্যদুঃস্থ স্ত্রীপুষ স্রেফ টিঁকে থাকবার প্রয়োজনে যাদের মধ্যেঅনেকেই নানা কুপথ অবলম্বনে বাধ্য হলেন। ঘুষ, জবরদস্তি, ধাপ্পাবাজি, অবৈধউপায়ে অর্থ এবং প্রতিপত্তি অর্জনের নানা ফন্দিফিকির মহামারীর মতছড়িয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে কলকাতায়। যে কোনো সমাজের শান্তি,শৃঙ্খলা, বিকাশের যেটি মুখ্য সর্ত— স ামাজিক নীতিবোধ বা ন্যায়-অন্যায়পার্থক্যের চেতনা— চল্লিশের দশকের আঘাতের পর আঘাতে কলকাতাতথা পশ্চি মবঙ্গ থেকে সেটি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়।

এই অন্ধকারাচ্ছন্ন চল্লিশের দশকে আমার যুবকাল কেটেছে।সারা জীবনের সঞ্চয় নিয়োগ করে অধ্যাপক পিতৃদেব কলক াতার কাছেই দমদমবিমানবন্দরের পাশে আমাদের পরিবারের জন্য ছোট একটি বাসস্থান নির্মাণকরেছিলেন। যুদ্ধ বাধবার পর সরকার বাড়িটি চবিবশ ঘন্টার নোটিশেঅধিগ্রহণ, বাস্তবে বাজেয়াপ্ত করে। আমার বাবার সুদীর্ঘ অধ্যাপক-

জীবনেরগ্রন্থসংগ্রহ (প্রায় পাঁচ হাজার বই, মুখ্যত সংস্কৃত ভাষায় লেখা,সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম, শিল্পতত্ত্ব, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ক)সেনাশিবিরের সাহেব কাপ্তানদের পশ্চাদ্‌দেশ সাফাইয়ের কাজে লাগে। সরকারকিছু পরে বাড়িটি ভেঙে সেখান দিয়ে সড়ক তৈরি করে। আমরা গৃহহীণঅবস্থায় ছড়িয়ে যাই। তা সত্ত্বেও আমি যদি অন্ধকারে তলিয়ে না গিয়ে থাকিতার প্রধান কারণ শৈশবে এবং বাল্যকালে বাবার কাছে শিখেছিলাম মৃত্যুওবরং কাম্য, কিন্তু যাকে অন্যায় বলে জানি তার সঙ্গে রফা করে বাঁচবার চেষ্টা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। দ্বিতীয় কারণ, প্রথম যৌবনে মার্ক্স এবংকিছু পরে মানবেন্দ্রনাথ রায় আম াকে শিখিয়েছিলেন যারা অত্যাচারিত তাদেরপক্ষ নিয়ে যারা শক্তিমান এবং অত্যাচারী তাদের বিদ্ধে দাঁড়ানোইপ্রকৃত মনুষ্যত্ব। এবং সম্ভবত তৃতীয় কারণ, পিতার সরল এবং উদারজীবনচর্যার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে বিত্ত বা প্রতিপত্তিকোনোদিনই আমাকে আকৃষ্ট করেনি। প্রেম, বন্ধুত্ব, জ্ঞানচর্চা এবংশিল্প-সাহিত্য সম্ভোগ আমাকে অল্প বয়সেই সেই আনন্দের স্বাদ দিয়েছিল অর্থবা প্রতিপত্তি যা দিতে অক্ষম।

যাই হোক, এখানে নিজের কথা লিখতে বসি নি। নিজের প্রসঙ্গটানবার কারণ চল্লিশের সেই অন্ধকার-পর্ব আমার প্রত্যক্ষঅভিজ্ঞতার বিষয়। আমার ধারণা চল্লিশের দশকে কলকাতার যে সর্বনাশ ঘটে তাথেকে না কলকাতা, না পশ্চিমবঙ্গ আজও উদ্ধার পেয়েছে, অথবা উদ্ধারের পথ খুঁজেপেয়েছে।

অবশ্য কোনো চেষ্টা যে হয়নি তা নয়। বিধানচন্দ্র রায় কলকাতারপুনর্জ্জীবনের আশা সম্ভবত ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের উৎকাঙক্ষায়কল্যাণীতে, দুর্গাপুরে এবং লবণহ্রদে কয়েকটি কেন্দ্র গড়ে তোলবার চেষ্টা করেন। মনে হয় তাঁর দিক থেকে চেষ্টার খামতি ছিল না,কিন্তু এই বৃহৎ উদ্যোগে উপযোগী সহকর্মী পান নি। চল্লিশের দশক অধিকাংশবাঙালি ভদ্রলোকের নৈতিক মেদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল। ধবংসের কাজে লোক খেপিয়েতোলা এ অবস্থায় সহজ ; গড়ে তোলার ক াজে নিষ্ঠাবান,পরিশ্রমী, দূরদর্শী, নিপুণ মানুষ মেলা খুবই শক্ত। তাছাড়া বিধানচন্দ্র দূরদর্শীএবং উদ্যোগী পুষ ছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বে প্রভুত্বাত্মপ্রবণতা উপযুক্ত সহকর্মী লাভের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে।

দ্বিখণ্ডিত দেশ এবং উদ্বাস্তুদের সমস্যা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ যখন মহাসংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তখন এসে গেল নতুন সংবিধান অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনেরচাপ। সংবিধান রচয়িতারা সদ্‌বিবেচনা করেই প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীপুষের সর্বজনীনভোটাধিকারকে পূর্বিতা দিয়েছিলেন। তাঁরা নিজেরা নির্বাচিত হয়েছিলেনমুষ্টিমেয় ব্যক্তির ভোটে। কিন্তু এই বিরাট দেশে বিপুল জনসমর্থনে যথার্থপ্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হলে যে সব পূর্ব সর্ত মেটানোদরকার তা মোটেই সে সময়ে সম্ভব ছিল না। যে দেশে অধিকাংশ লোকনিরক্ষর, এবং নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কোনোদিনইতারা সংগঠিত ভাবে চেষ্টা করে নি, সেখানে কার্যক্ষেত্রে গণতন্ত্রেরনামে সর্বজনীন ভোটাধিকার অনেকটাই প্রহসনে পর্যবসিত হতে বাধ্য।বিরাট নির্বাচন ক্ষেত্র ব া কনস্‌টিটুয়েন্সির প্রত্যেক নির্বাচনদাতারসঙ্গে যোগ স্থাপন বা ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা প্রচুরব্যয়সাপেক্ষ। এ কাজের জন্য যঁ ারা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করতেসক্ষম তাঁদের পক্ষেই নির্বাচনে নামা সম্ভব। সেই টাকা যোগাড়করবার জন্য অসংখ্য রকমের নীতিবিদ্ধ পন্থা উদ্ভাবিত হতে লাগল। সৎ, কর্তব্যনিষ্ঠ সমাজসেবীর বাঞ্ছানীগুণীর পক্ষে বিরাট ব্যয়সাপেক্ষ নির্ব াচনে দাঁড়ানো এক্ষেত্রে অকল্পনীয়। অসৎ উপায়ে অর্থসংগ্রহ, আত্মপ্রচার অথবানির্বাচকদের মিথ্যা স্তোক দিয়ে সমর্থন ল াভ, অথবা কোনো না কোনোরাজনৈতিক দলের ব্যবহার্য যন্ত্রে পর্যবসিত হওয়া— এসব তাঁদের কাছে সংগতকারণেই ঘৃণ্য ঠেকায় তাঁরা প্রায় কেউই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেননি। চল্লিশের দশক নীতিবোধের গোড়ায় আঘাত করেছিল, পঞ্চ াশের এবংষাটের দশকে ভোটের নামে নানা রকমের তঞ্চকতা, ভ্রষ্টাচার,অপক্রিয়া সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। স্বাধীনতা অর্জনের আগে যে আদর্শবোধ কয়েকপ্রজন্ম ধরে শিক্ষিত তণতণীদের আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত করেমহত্তর সমাজ-স্বার্থ সাধনে আত্মনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করেছিল, ভোটাভুটির ধাক্কায়তা প্রায় বিলুপ্ত হল। রাজনৈতিক দলনেতারা তাঁদের অনুচরদের এইদুর্নীতিতে দীক্ষা দিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর গান্ধি কংগ্রেসকে ভেঙেদিয়ে জাতীয় সেবাদল গড়তে চেয়েছিলেন। মানবেন্দ্র তাঁর দল ভেঙে দিয়েছিলেন।কিন্তু নেহ, প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা গান্ধিপ্রস্ত াবকে কোনো পাত্তাই দেন নি। মানবেন্দ্রের দলের সে সময়ে কোনোই প্রভাব ছিল না। সুতরাং দল ভেঙে দেওয়াতে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধিহল না।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তৎপূর্বকালীন স্বাধীনতাসংগ্রামীদেরমধ্যে অনেকে হয় বিস্মৃত নয় পেনশনভোগী হয়ে গেলেন। যাঁর া একসময়েসমাজবিপ্লবের আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে ঝুঁকির পথ বেছেছিলেন, তাঁদেরমুখ্য দলটি স্বাধীনতার পরে আইনসঙ্গত

পথে ক্ষমতার শরিক হবার পথ বেছেনিলেন। কমিউনিস্ট দল ষাটের দশকে দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায় ; কিন্তুতার আগেই পার্টির মুখ্য নেতারা সাম্যবাদের ঘোষিত আদর্শ বিসর্জনদিয়েছিলেন। কমিউনিস্টদের ভিতরে যে স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি তাঁদেরআগেকার ধ্যানধারণা একেবারে ছাড়তে পারেননি, তাঁরা তৃতীয় দল গড়েএকটা আন্দোলনের চেষ্টা করেছিলেন বটে। কিন্তু একদিকে জনসমর্থনের অভাব,অন্যদিকে তাঁদের নিজেদের নেতাদের ভিতরেই প্রবল এবং প্রায়হিংস্র মতভেদ তাঁদের পায়ের নিচে কোনোনির্ভরযোগ্য জমি রাখল না। যাঁরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়ছিলেন তাঁরা এই বহুবিভক্ত নকশালপন্থীদের নিষ্ঠুর হাতে দমন করলেন।গত একপাদ শতাব্দীকালের বেশি সময় ধরে পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্টরাক্ষমতায় আসীন বটে, কিন্তু অসাম্যের বিলোপ অথবা ন্যায় প্রতিষ্ঠাযে তাঁদের উদ্দিষ্ট, তাঁদের ক্রিয়াকলাপে এবং ঘোষণাতে তারপ্রমাণ মেলে না। কংগ্রেস যেমন একই সঙ্গে স্থানে অস্থানে গান্ধিরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে জীবনের এবং বিশেষ করে রাজনীতিরসর্বক্ষেত্রে গান্ধির আদর্শকে খারিজ করেছে, পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্টরাও তেমনি মার্ক্স-এঙ্গেলস-লেনিনের মস্ত মস্ত মূর্তি শহরের কেন্দ্রে স্থাপিতকরেছে বটে, কিন্তু তাদের প্রধান প্রায় একমাত্র উদ্দেশ্য যে কোনোউপায়ে ক্ষমতায় দখল বজায় রাখা, এবং সেজন্য প্রয়োজন মাফিক সবরকম অপকর্মে আশ্রয় নিতে তারা দ্বিধাহীন। একদিকে লোভ, অন্যদিকে ভয় দুইমিলিয়ে এখানে কমিউনিস্টদের প্রশ্রয় এবং তাদের ক্ষমতা বজায়েরজন্য ব্যবহার্য হাতিয়ার হিসেবে বিভিন্ন মাফিয়া গোষ্ঠীর সম্প্রতি এখানেরবরবা। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সৎ, ভদ্র এবং সংস্কৃতিমনস্ক বলেই জানি। কিন্তু তাঁরব্যক্তিগত সৌজন্য তাঁর পার্টির আত্মঘাতী রূপটিকে ততটাই আবৃত করেছে যতটাকরেছে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর কাব্যচর্চা তাঁর দল এবং রাজনৈতিকপরিবারের হিংস্র আগ্রাসী হিন্দুত্ববাদের ক্রিয়াকর্ম এবং সাম্প্রদায়িক স্বরূপকে।

।।চার।।

এই পটভূমি স্মরণে রেখে আমরা প্রবন্ধের সূচনায়যে প্রশ্নটির উল্লেখ করেছি সেটিতে ফিরে আসি। জন্মসূত্রে সবমানুষের মধ্যেই বিভিন্ন বৃত্তি বা প্রবণতা আছে যাদের মধ্যে অনেকগুলিপরস্পরবিরোধী। এদের ভিতরে কোনো প্রধান বৃত্তি বা প্রবণতাকেসম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা যায় কিনা সন্দেহ ; অনেক ক্ষেত্রে নিরোধেরচেষ্টার ফলে দুশ্চিকিৎস্য মানসিক ব্যাধি দেখা দেয়। কিন্তু এপ্রস্তাব অভিজ্ঞতা-সমর্থিত যে পারিবারিক, সামাজিক ওপ্রাকৃতিক পরিবেশ এবং শিক্ষার ফলে কোনো কোনো বৃত্তি বাপ্রবণতার বলাধান ঘটতে পারে। যেমন ধরা যাক ভালবাসা। এটি মানুষেরএকটি সহজাত প্রবৃত্তি। উপযোগী পরিবেশ এবং সুশিক্ষার ফলেপ্রথমে যা শুধু মায়ের প্রতি টান তা ক্রমে ক্রমে শুধু আত্মীয়স্বজনবন্ধু-সহকর্মী নয়, ভাষা, জাতি, শিল্প-সাহিত্য, প্রকৃতিপরিবেশ,মনুষ্যজাতি, এবং অন্য জীবজন্তুর প্রতি গভীর অনুরাগে পরিণতি পেতে পারে।ভালবাসার অর্থ নিজের স্বার্থের চাইতে যাকে ভালবাসি তার কল্যাণের কথাবেশি ভাবা, তার জন্য ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকা, তার অভাবে কষ্টএবং তার সান্নিধ্যে আনন্দ পাওয়া। অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে ভালবাসার বোধহয়ত পরিচিত কিছু ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু তেমন উদারপরিবারে জন্মালে বা তেমন সুস্থ পরিবেশে বাস করলে বা তেমনসুশিক্ষা পেলে মানুষ বসুধাকে যথার্থই কুটুম্ব বলে গ্রহণ করতে পারে।এমন স্ত্রীপুরুষের সংখ্যা গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে বঙ্গদেশেও একেবারে নগণ্য ছিলনা।

এখন ভালবাসার পাশাপাশি আছে দখলদারির বা অধিকারপ্রতিষ্ঠার প্রবণতা বা প্রবৃত্তি। অনেক ক্ষেত্রে এ দুটিখুবই দুচ্ছেদ্যভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়িত থাকে। শিশু চায় একান্তভাবেতার মাকে ; মা অন্য কারো দিকে মন দিলে তার ঈর্ষা হয় ; পরে তা বিদ্বেষেও রূপ নিতে পারে। প্রেমিক-প্রেমিকারাওঅধিকাংশ সময়ে একে অপরের উপরে নিজের একান্ত স্বত্ব দাবি করে, এবংসে দাবি অবাস্তব প্রমাণিত হলে তাদের সম্পর্ক বিষাক্ত হয়ে ওঠে। যেপরিবারে স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, মাতা-পিতা এবং সন্তানদের মধ্যে ভালবাসাসুপ্রতিষ্ঠ সেখানে এই দখলদারির প্রবণতা প্রশ্রয় পায় না।সুস্থ পরিবেশ এবং জীবনচর্যার সুশিক্ষা এই সব পরিবারের মূলধন।প্রাজ্ঞ শিক্ষক, সজ্জন পাড়া প্রতিবেশী, সহৃদয় সহপাঠি-সহকর্মী,এবং অবশ্যই মহৎ চিন্তকদের রচনা থেকে একজন মানুষ শিখতে পারে যেদখলি স্বত্বের দাবি ভালবাসায় পরিপূর্ণতা না এনে তার গোড়ায় ঘুণ ধরায়।চিত্তের মুক্তিই যথার্থ ভালবাসার প্রশস্ত ক্ষেত্র।

এখন লক্ষণীয় যে মানুষের মধ্যে যে-সব বৃত্তি বা প্রবণতাপরস্পরকে আত্মীয় করে তোলে বিশেষভাবে গত বিশ বছরে নানা কারণেরসমাবেশে সেগুলি প্রায় সর্বত্রই ঘোরতর ভাবে ব্যাহত। আমি আগে উল্লেখকরেছি যে আদর্শের প্রেরণা ব্যক্তিকে স্বার্থপরতার সংকীর্ণ গণ্ডী থেকেউদ্ধার করে বৃহত্তর মানবসমাজের প্রতি কল্যাণকামী করে তোলে। বঙ্গীয়রেনেসাঁস, তারপর

স্বাধীনতা আন্দোলন এবং তারপরে সাম্যবাদের প্রভাববাঙালি তণতণীদের চিত্তকে একসময়ে আত্মকেন্দ্রিকতা, ক্ষুদ্রমনস্কতা ওঅপহুতি থেকে অনেকটা মুক্ত করেছিল। নকশাল আন্দোলন ভুল পথে গেলেও তারভিতরে কিছুটা আদর্শবাদের ভগ্নাবশেষ প্রেরণা হিসেবে কাজকরেছিল। রাষ্ট্রশক্তির নিরঙ্কুশ নির্বিবেকী প্রয়োগে সেআন্দোলনকে হিংস্রভাবে নিষ্পিষ্ট করা হয়। তারপর গত বিশ বছরে পশ্চিমবঙ্গেকোনো ক্ষেত্রেই কোনো আদর্শবাদী আন্দোলন দেখা দেয় নি। কলেজে-স্কুলে,লেখক-শিল্পী-সাহিত্যিক মহলে, সরকারী বেসরকারী দপ্তরে, মধ্যবিত্ত এবংনিম্নমধ্যবিত্ত সমাজে এক সর্বব্যাপী শুভনাস্তিক শূন্যতা বিস্তার লাভকরেছে। সমকালীন মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজে আত্মকেন্দ্রিকতার প্রাবল্য এরিঅন্যতম ফল। সকলেই জানেন গত বিশ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থাকী দ্রুতহারে নিম্নগামী। অবশ্য এ দেশে শিক্ষাব্যবস্থা কোনো দিনই খুবদৃঢ়মূল ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পূর্বে এবং তারপরও কিছুকালশিক্ষার অন্তত একটা মান এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে ঔচিত্যবোধপ্রতিষ্ঠিত ছিল। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু শিক্ষকই বিশেষযত্ন নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াতেন, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদেরশ্রদ্ধার এবং স্নেহের সম্পর্ক ছিল। ছাত্র এবং অধ্যাপক হিসেবে কয়েক দশক ধরে এইঅবস্থার সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। গত বিশ বছরে এটিপ্রায় স্মৃতিতে পর্যবসিত হয়েছে। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, কিন্তু তাব্যতিক্রম মাত্র। এখন বহু শিক্ষকই ক্লাসে পাঠ্য বিষয় যত্ন করে না পড়িয়েপ্রাইভেট টিউশনির ব্যবসা খুলে বিস্তর অর্থ উপার্জন করেন।পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যে বা ভাল ফলের জন্য ছাত্রছাত্রীরা সেখানেভীড় করে বটে, কিন্তু এই পরিবেশে শ্রদ্ধা বা স্নেহের বা নির্ভরযোগ্যআত্মীয়সম্পর্কের কোনো স্থান নেই। মানবীয় আসঙ্গ বা সংসৃতির স্থাননিয়েছে বাজারি সম্পর্ক। শুধু ছাত্রশিক্ষকের সম্পর্ক বিকৃত হয়নি ; ছাত্রদের মধ্যেও প্রীতি সহযোগ বন্ধুত্বের স্থানে এসেছে প্রবলপ্রতিযোগিতা এবং শ্রেণীভেদ। পারিবারিক বিত্ত-সামর্থ্যের জোরে যারাইংরেজি-মাধ্যমে আগাগোড়া পড়ার সুযোগ পায় তাদের চোখে বাংলা মাধ্যমেপড়া ছাত্রছাত্রীরা নিম্নস্তরের জীব। উত্ত ওপরের স্তরের ইংরেজিবুলি আওড়ানো তণতণীদের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা কে কাকেল্যাং মেরে ওপরে উঠতে পারে। তাদের মধ্যে স্থায়ী সখ্য বা সৌহার্দ্যখুবই দুর্লভ। আর যারা নিচে রয়ে গেল তারা শুধু হীনম্মন্যতায় ভোগেনা, তাদের অন্তর্গ্লানি রূপ নেয় আক্রোশে, হিংসা পরায়ণতায়, তারাসহজেই ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকর্মে আকৃষ্ট হয়। এখনকার আগ্রাসী রাজনৈতিকদলগুলি, তণ বা ছাত্র সংগঠনের এরাই হয়ে ওঠে ব্যবহার্য উপাদান। বর্তমানেআমাদের শিক্ষাজগতের পরিবেশ তণ চিত্তের সুস্থ বিকাশের পক্ষেমারাত্মক।

এটিও বোঝা দরকার যে গত দু' দশকে পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবিত্তএবং তাদের অনুসরণে নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজে যে আত্মকেন্দ্রিকতা প্রবল হয়েউঠেছে, তার কারণ একদিকে যেমন পূর্ববর্তীদশকগুলির অবক্ষয়ী উত্তরাধিকার তেমনই অন্যদিকে সমকালীন বিশ্বব্যাপীনানা প্রবল চাপ। বিশ্বায়নের ফলে আমাদের আদর্শহীন জীবনযাত্রার ওপরেবাইরের, বিশেষ করে আমেরিকার, প্রভাব দ্রুত বিস্তার লাভকরেছে। আমাদের তণ প্রজন্মের মধ্যে যারা তাদের অধ্যবসায়ার্জিতবিদ্যা এবং প্রয়োগ নিপুণতার সামর্থ্যে হয়তো এই দেশের মধ্যেই নতুন একসামাজিক-সাংস্কৃতিক জাগরণে নেতৃত্ব দিতে পারত তারা প্রায় সকলেইসুযোগ পাওয়া মাত্র এ দেশ ত্যাগ করে আমেরিকায় বা অন্য কোনো প্রাচুর্যেরদেশে চলে যাচ্ছে। এই ছেলেমেয়েদের মা-বাবা, পরিবার-পরিজন, শিক্ষক বাঅন্য বুদ্ধিজীবীরা কোনো সময়েই চেষ্টা করেননি তাদের বোঝাতে যে দেশএবং দেশবাসীর প্রতি তাদের গভীর দায়িত্ব আছে, যে প্রীতি,প্রেম, সখ্য, সহযোগ বঞ্চিত জীবনের নিঃসঙ্গতা ও শূন্যতাবোধ বিত্ত-প্রতিপত্তিদিয়ে ভরানো যায় না, যে বিলাসব্যসনে নয়, সৌহার্দ্য, সেবা এবং সৃষ্টিরভিতর দিয়েই স্থায়ী আনন্দের অভিজ্ঞতা মেলা সম্ভব। গত প্রায় দুটিপ্রজন্ম আধুনিক প্রচারমাধ্যমের বলি। দূরদর্শনের নেশা একদিকেমনন বা চিন্তনের সমাহিতি ঘটিয়ে ব্যক্তিকে প্রায় নিষ্ক্রিয় দর্শকেপর্যবসিত করে, অন্যদিকে প্রাচুর্য, ভোগবিলাস এবং লঘুচিত্তপ্রমোদের রঙ্গিলা ছবি দেখিয়ে তণ মনকে লোভী এবং মতিভ্রান্ত করে।নির্দায়িত্ব লোলুপতার এবং লোভ মেটাবার জন্য নীতিবোধহীন ক্রিয়াকলাপেরইন্ধন মেলে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়, মাসিকে, সাপ্তাহিকে, তথাকথিত নানাসাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, এবং সর্বোপরি বিজ্ঞাপনের ছয়লাপে। জীবনের উদ্দেশ্যকী তা নিয়ে চিন্তা তো দূরের কথা, একত্রে বসে নানা বিষয়েভাববিনিময়, স্মৃতি-অভিজ্ঞতার আদানপ্রদান, স্রেফ সৌহার্দ্যস্নিগ্ধগালগল্প করতেও টেলিভিশনের নেশাগ্রস্ত মানুষরা ক্রমশ ভুলে যাচ্ছে।বস্তুত বিশ্বায়নের ফলে বিশ্বের সঙ্গে কুটুম্বিতা বাড়ার বদলে যা ক্রমেইপ্রবল হয়ে উঠছে তা হল ব্যক্তি-মানুষের সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্নঅস্তিত্ব।

বস্তুত আত্মকেন্দ্রিকতার প্রথম বলি মানবীয় সম্পর্ক। পশ্চিমেযেখানেই অধ্যাপনা সূত্রে কিছুকাল থেকেছি সেখানেই প্রকৃতি, পরিবার এবংসমাজ থেকে ব্যক্তির আত্মিক বিচ্ছিন্নতার এবং তজ্জাত সমস্যার ব্যাপ্তি এবংপ্রাবল্য দেখে বিষাদিত হয়েছি। খুব সামান্য কারণেই স্বামীস্ত্রী-রসম্পর্কছেদ, পরিবার ভেঙে যাওয়া, প্রজন্মের সঙ্গে প্রজন্মেরবিরোধ, বন্ধুত্বের অবসান বারে বারে দেখে কিছুটা বুঝতে শিখেছি“পৃথিবীর গভীর অসুখে”-র কথা। একটি নিতান্তনিরানন্দ অভিজ্ঞতার উল্লেখ করি। মার্কিন দেশে প্রশান্ত মহাসাগরেরকূলে একটি ন্বিবিদ্যালয়ে অধ্যাপনার নিমন্ত্রণে কয়েক মাসের জন্য সপরিবারেগিয়েছি। সাগরতীরের পাশ ধরে ন্বিবিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস এবং ছাত্রছাত্রীদেরবাসস্থান। তীরের সমতল জমি থেকে উঠে গেছে কমলা লেবুর ক্ষেতভর্তি পাহাড়ের সারি, ওপরেই আসল শহর, সেখানে মাঝবয়েসী এবং বিত্তবানদেরনিবাস। অধ্যাপকরা প্রায় সকলে সুন্দর শহরটিতে এক একটি বাড়ি-বাগাননিয়ে একা অথবা স্বামীস্ত্রী দুজনে থাকেন। ন্বিবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাদেরজন্য ওপরে শহরে থাকবার ব্যবস্থা করলেও আমরা স্বেচছায় ছাত্র পাড়াতেইএকটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিই। একদিন আমার এক ছাত্রের পিতা, তিনিও ঐন্বিবিদ্যালয়ের অধ্যাপক, তাঁর গৃহে আমাকে চায়ের নিমন্ত্রণ করলেন। কথায়কথায় আমাকে শুধোলেন, ওই বেজন্মা (ঐব্বদ্ধজন্তু) অর্থাৎ তাঁর ছেলে আমাকে কতটাজ্বালাচেছ। প্রশ্নটির মধ্যে কোনো রসিকতার আভাস ছিল না, ছিলস্পষ্টতই তিক্ততার স্বাদ। কিন্তু ছেলেটি পড়াশুনোয় মনোযোগী। আমার সঙ্গেতার সম্পর্ক প্রীতিকর, সুতরাং “ঐব্বদ্ধজন্তু”শব্দটি শুনে আমি মৃদু প্রতিবাদ করলাম। অধ্যাপক তখন তাঁর ছেলেরকুকীর্তির মস্ত ফিরিস্তি দিলেন। আমি তাঁর কথা ন্বাস করতেনা পারলেও যথেষ্ট বিচলিত হয়েই ফিরে আসি।

কয়েকদিন পরেই কোনো একটি বিষয়ে বুঝবারজন্য ঐ ছাত্রটি আমার ঘরে এল। বিষয়টি নিয়ে আলোচনার পর ছেলেটি একটু তিক্ত হেসে বলল, শুনলাম তুমি নাকি ওই বেজন্মার প্রাসাদে চা খেতেগিয়েছিলে। ছেলের মুখে তাঁর বাবা সম্পর্কে একই শব্দের পুনঃপ্রয়োগ শুনেযতটা চমকালাম তার চাইতে বেশি কষ্ট পেলাম যখন সে তার পিতারবিবিধ নষ্টামির বিবরণ দিল। তার কথাও কতটা সত্য আর কতটাপ্রতিহিংসা-প্রসূত জানি না, কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই টের পেলাম দুই প্রজন্মের মধ্যেই এই তিক্ত, প্রায় হিংস সম্পর্কমধ্যবিত্ত শ্রেণীতে খুবই ব্যাপক।

পশ্চিমবঙ্গে অবস্থা নিশ্চয়ই এতটা উগ্র এবং আপোষহীনস্তরে নামে নি, কিন্তু এখানেও প্রজন্মের সঙ্গে প্রজন্মেরব্যবধান দ্রুত বাড়ছে, এবং তা ত্রমেই বিরোধিতার রূপ নিচেছ। অথচ তার ফলেতণ প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মধ্যে সুহৃদ-সম্পর্ক যে আদৌ দৃঢ়মূল হচেছতার চিহ্ন দেখি না। একদিকে কোনো রকম আদর্শের অভাব, অন্যদিকে বিবিধপ্রচারমাধ্যম মারফত ন্বায়ন তথা মার্কিনায়নের বিস্তার আমাদেরবর্তমান তণ প্রজন্ম এবং তাদের ঠিক পূর্ববর্তী প্রজন্মকেযেমন পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে, তেমনই উভয় প্রজন্মকেইআত্মকেন্দ্রিক করে তুলেছে। এই আত্মকেন্দ্রিকতার অর্থ শুধু স্বার্থপরতা নয়। এরমধ্যে নিহিত আছে নীতিবোধহীনতা, যে কোনো উপায়ে বিত্ত প্রতিপত্তি অর্জনেরউৎকাঙক্ষা, শক্তিমান এবং বিত্তবানের বশংবদ হবার প্রবণতা, দীন এবংদুর্বলের প্রতি ঘৃণা এবং তাচ্ছিল্য, অপরিমিত অর্থোপার্জনের চেষ্টাএবং বিবর্ধমান ভোগলালসা। এইসব প্রবণতা যাদের মধ্যেই অতি প্রবলতারা উচচবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্ত্রীপুষ। এবং যা আরো দুর্ভাবনার বিষয়,এদের দেখাদেখি এই মনোভাব নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্ত্রীপুষ এবং তণতণীদের মধ্যেওদ্রুত ছড়িয়ে যাচেছ। অথচ সমাজের ন্যায়ভিত্তিক পুনর্গঠনের উদ্যোগেশিক্ষিত তণদের ভিতর থেকেই নেতৃত্ব আসবার কথা। সেখানেই এইস্বার্থপর ভোগপরায়ণ লঘুচিত্ততার প্রসার দেখে স্বয়ং পঞ্চভূতেপ্রত্যাবর্তনের পূর্বে খুবই আর্ত বোধ করি।

।।পাঁচ।।

তবু ভাবতে ইচেছ হয়, এখনো হয়তো পশ্চিমবঙ্গের চরমবিপর্যয় অনিবারণীয় নয়। পশ্চিমেও আধুনিক সভ্যতার আগ্রাসী প্রবণতাকেরোধ করে সহযোগ এবং সংগতির ভিত্তিতে ছোট ছোট কমিউনিটি গড়েতোলবার নানা উদ্যোগ কিছুকিছু তণতণীদের ভিতরে দেখেছি। কেন্দ্রিতরাষ্ট্রশক্তি এবং অর্থশক্তি এবং বিরাট প্রভাবশালীপ্রচারমাধ্যমের বিদ্ধে তাদের এই আদর্শবাদী প্রয়াস কতটাফলপ্রসূ হবে জানি না। কিন্তু ইতিহাস কোনো পূর্বনির্দিষ্ট পথে চলেনা। বাইরে থেকে যখন কোনো সভ্যতাকে খুবই প্রবল মনে হয়, ভিতরথেকে তার অবক্ষয় হয়তো তখনই সত্রিয় হয়ে উঠছে। অন্তত যেসভ্যতা বুশের মতো প্রায়োন্মাদ ব্যক্তিকে একটা মহাশক্তিশালী রাষ্ট্রেরচূড়ায় বসায় তার স্থায়িত্ব বেশি দীর্ঘ না হওয়াই সম্ভব। আবার হয়তোতার আপজাত্যের ভিতর থেকেই আধুনিক সভ্যতার আমূল রূপান্তরেরসম্ভাবনা ত্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

তবে এখানে যেহেতু আমাদের আলোচ্য বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিসমাজ, সে হেতু এ কথা স্পষ্টভাবে বলা সঙ্গত মনে

করি যে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশমানুষ নয়, মুখ্যত উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকাংশস্ত্রীপুষরাই গত বিশ বছরে দ্রুত আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। অধিকাংশপশ্চিমবঙ্গবাসী স্রেফ টেঁকার সমস্যা নিয়েই বিপর্যস্ত এবং পারস্পরিক সহযোগছাড়া তাদের পক্ষে টেঁকা প্রায় অসম্ভব। শহরে এবং গ্রামে দরিদ্র এবংঅতিদরিদ্র শ্রেণীর যে সব স্ত্রীপুষের সঙ্গে আমার সীমাবদ্ধ যোগাযোগ আছে তাদেরমধ্যে যেমন আত্মোন্নতি বা আত্মজিজ্ঞাসার চাড় বিশেষ দেখিনি, তেমনই আত্মপরায়ণতার বা আত্মকেন্দ্রিকতার উপস্থিতি থাকলেওতা নিতান্ত স্তিমিত। কিন্তু এ লেখা যাঁরা আদৌ পড়বেন তাঁরামধ্যবিত্ত অথবা নিম্নমধ্যবিত্ত এবং শিক্ষিত শ্রেণীর স্ত্রীপুষ। তাঁদের উদ্দেশেপরিশেষে কয়েকটি কথা নিবেদন করি।

আত্মকেন্দ্রিকতা ও আত্মোন্নতি সমার্থক নয়। এই বঙ্গদেশেই বিশশতকের গোড়ায় একটি "আত্মোন্নতি" সংস্থা গড়েউঠেছিল যার সদস্যদের মূল সাধনা ছিল পরাধীনতা থেকে দেশকে মুক্ত করা,নিজের চিত্তকে সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তা থেকে ঊর্ধ্বে তোলা, যাঁরা দুঃস্থ,সহায়সম্বলহীন তাঁদের সেবা করা। তাঁরা স্বার্থসাধনকে আত্মোন্নতির নাম দিয়েআত্মপ্রতারণা করে নি। আবার যে ব্যক্তিগত উদ্যোগ-উদ্যমের ফলেআধুনিক সমাজের বিকাশ সম্ভব হয়েছিল তাও ছিল বহির্মুখী, আত্মকেন্দ্রিক নয়। আসলেআত্মকেন্দ্রিকতা সমাজস্বার্থের বিরোধী। বিত্ত-প্রতিপত্তির লোভে নিজেরা এবংপরে তাদের শিক্ষায় এবং প্রশ্রয়ে তাদের পুত্রকন্যারা যেআত্মকেন্দ্রিকতাকে নীতি হিসেবে সম্প্রতিকালে গ্রহণ করেছে তা তাদের মনুষ্যত্বকেবিকৃত করছে, এবং তা সুস্থ মানবীয় সম্পর্কের গোড়ায় আঘাত করে সমাজএবং সভ্যতাকে ধবংসের পথে এগিয়ে দিচ্ছে।

এই আত্মঘাতী প্রবাহকে রোধ করে যদি সমাজে নৈতিকতাএবং সহযোগবৃত্তির পুনর্জ্জীবন ঘটাতে হয় তবে প্রথমেই দরকারপারিবারিক জীবনে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল রূপান্তরের জন্যব্যাপক আন্দোলন। তথাকথিত নিউক্লিয়ার পরিবার হয়তো নারীদেরস্বাধীনতা অর্জনের কিছুটা সহায়ক হয়েছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্বামীস্ত্রী ও পুত্রকন্যারমনে নিরঙ্কুশ স্বার্থপরতা এবং অপরিমিত ভোগাকাঙ্ক্ষার প্রশ্রয়দিয়েছে। পুরোনো একান্নবর্তীর পরিবারের মডেলে ফেরবার চেষ্টাসম্ভবও নয়, সঙ্গতও নয়। কিন্তু মানবিক সম্পর্কের বিকাশের জন্য সম্ভবত তিনপুষের একত্র বাসের প্রয়োজন আছে ; এবং পড়োশীদেরসঙ্গে মিলিতভাবে আত্মীয়সমাজ গড়ে তুললে হয়তো সৌহার্দ্য এবং সহযোগ আবারমানবিক জীবনযাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

আর শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন নির্ভরযোগ্য জ্ঞানার্জনেরব্যবস্থা অবশ্যই জরি, তেমনই সমান জোর দেওয়া দরকার সুস্থজীবনচর্যার শিল্পের ওপরে। প্রকৃতির বিচিত্র রূপ এবংঅফুরন্ত দানের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে গাছপালা, পশুপাখি,নদীপ্রান্তর, পাহাড়-অরণ্যের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধ ; বিভিন্নধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতির স্ত্রীপুষকে সুহৃদ্ সুজন হিসেবে স্বাগত করতেশেখা ; জীবনের কেন্দ্রে সত্যনিষ্ঠা, সাহস, সৌন্দর্যবোধ, বিবেকবুদ্ধি,সেবাবৃত্তির প্রতিষ্ঠা—মানসবিকাশের জন্য এই অতি আবশ্যকদিকগুলি আজকের শিক্ষাব্যবস্থায় সম্পূর্ণ অবহেলিত। অথচ এইসব বাদদিয়ে যে শিক্ষা সে তো মানুষকে বড় জোর নিরঙ্কুশ যন্ত্রবিদ অথবাঅপরের ব্যবহার্য যন্ত্রে পরিণত করবার শিক্ষা। আত্মঘাতী আত্মকেন্দ্রিকতারপ্রভাব থেকে বাঙালি সমাজকে উদ্ধার করে পশ্চিমবঙ্গের পুনর্জাগরণ যদিঘটাতে হয়, তবে সে কাজে মুখ্য ভূমিকা শিক্ষিত তণতণী সমাজের। যেদায়িত্ব তাদের পূর্ববর্তীরা পালন করেন নি বা করতে পারেন নি একুশশতকের সূচনায় নবীন প্রজন্মের ছাত্রছাত্রী, তণশিক্ষকশিক্ষিকা, এবং সমাজসেবকসেবিকারা কি সে দায়িত্বভার নিজেদেরকাঁধে তুলে নেবে? পঞ্চভূতে প্রত্যাবর্তনে প্রস্তুত আমার মতো ৮২বছরের নাস্তিকেরও কিছু স্বপ্ন অবশিষ্ট থাকে। যা আমরাপারি নি নবীন প্রজন্ম হয়তো সেই সুস্থতায় প্রত্যাবর্তনেব্রতী হবেন, বহুবার আশাভঙ্গের পরও সে প্রত্যাশা আজও ছাড়তে পারি নি।

১লা মার্চ, ২০০৩

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com